

দেনাপাওনা

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিল নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল-- গণেশ, কার্তিক, পার্বতী, তাহার উদাহরণ।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদি ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সন্মত হইলেন ; এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এ দিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, “শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিয়া দিব।” রায়বাহাদুর বলিলেন, “টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।”

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া, চুপ করিয়া

বসিয়া আছে ভাবী শৃঙ্গুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, “কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইবা”

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, “দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার” দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, “শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই”

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দ ভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শৃঙ্গুরবাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, “তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা” রামসুন্দর বলিলেন, “কেন আসতে দেবে না, মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসবা”

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পাননা।

কুটুস্বগৃহে এমন করিয়া অপমান তো সহ্য যায় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারই ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে ; এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এ দিকে শৃঙ্গুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ির আক্ৰোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, “আহা, কী শ্রী! বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।” শাশুড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, “শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।”

এমন-কি, বউয়ের খাওয়াপরাও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ি বলে, “ঐ ঢের হয়েছে।” অর্থাৎ বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয় কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবো। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন ; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো-বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পঙ্ককেশে শুষ্কমুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে, তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের স্নান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, “বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও” রামসুন্দর বলিলেন, “আচ্ছা”

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই-- নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন-কি, কন্যার দর্শন, সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে- সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোট-কথানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেক্ষেপের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন; শহরে একটা নূতন ব্যামো আসিয়াছে, সে- সম্বন্ধে অনেক আজগুবি আলোচনা করিলেন; অবশেষে ছঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, “হাঁ হাঁ বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি” এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অটহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, “থাক্ বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই” একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারো মুখে আসে না-- কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, “সে-সকল কুটুস্থিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না” মর্মান্বিতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, “সে এখন হচ্ছে না” এই বলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল-- তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, “এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি”-- খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, “দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?” বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন, এবং সে- সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ষিক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর- কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই ; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে ; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তার পরে রামসুন্দর কহিলেন, “এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি, মা। আর কোনো গোল নাই”

এমন সময় রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, “বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে ?”

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, “তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে ?” রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন ; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, “দাদু আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না ?”

নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুৎসাহে গিয়া বলিল, “পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে ?”

নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, “বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শৃঙ্গুরকে দাও, তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।”

রামসুন্দর বলিলেন, “ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তা হলে তোর বাপের অপমান আর তোরও অপমান।”

নিরু কহিল, “টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দামা না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।”

রামসুন্দর কহিলেন, “তা হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা”

নিরুপমা কহিল, “না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।”

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই-যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণদাসী নিরুর শাশুড়িকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শূশুরবাড়ি শরশয়া হইয়া উঠিল। এ দিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে ; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়, এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়িকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে-যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তৃগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ির সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন, তবে শাশুড়ি বলিতেন,

“নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।” কখনো-বা বলিতেন, “দেখো-না একবার, ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।”

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, “ওঁর সমস্ত ন্যাকামি” অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িকে বলিল, “বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা” শাশুড়ি বলিলেন, “কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছলা”

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না-- যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল, সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়োবউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমাবিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরিদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল-- এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনো দেখে নাই। এমন ঘটনা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময় তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এ দিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, “আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবো” রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, “বাবা তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবো”

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

১২৯৮ ?

পোস্টমাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টআফিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলো। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস ; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহার ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়-- কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয় এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতনা। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত--যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিরূদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন “রতন”। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না-- বলিত, “কী গা বাবু, কেন ডাকছ”

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে-- হেঁশেলের-- পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন-- একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?” সে অনেক কথা ; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিস্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল-- বহু পূর্বের বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল-- অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সঁকিয়া আনিত-- তাহাতেই উভয়ের রাতের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন--

ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উঠিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না-- সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্রণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র জুপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল ; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত-- হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টামাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টামাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, “রতন”। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল ; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল-- হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “দাদাবাবু, ডাকছ ?” পোস্টামাস্টার বলিলেন, “তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাবা”

বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া “স্বরে অ” “স্বরে আ” করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষাণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ-- নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন-- বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল “রতন”। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, “দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?”

পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, “শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না-- দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে”

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি?”

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন-- মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবো। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না ; মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, “দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?”

পোস্টমাস্টার বলিলেন, “রতন, কালই আমি যাচ্ছি।”

রতনা কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতনা। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে ; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ টপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রানঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহ্বার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?”

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, “সে কী করে হবে” ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যিক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কর্ণস্বর বাজিতে লাগিল-- ‘সে কী করে হবে’।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে ; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই ; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, “রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।” এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উদ্ভিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নো”

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, “রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।”

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু

দিতে হবে না ; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না”-- বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুশিখর মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন-- একটা সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, “ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি”- কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে- এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টআপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে-- সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

১২৯৮ ?

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণী নীচে আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গৌরবদাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হুস্বা তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাআ শুকাইয়া যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, যাহাদের ছল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের দুই একত্রে ছিল। এ দিকে কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত, ও দিকে তীব্র বাক্যজ্বালায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, পুরাকালের মতো গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই ; ছাত্রেরা গুরুকে আর দেবতার মতো ভক্তি করে না ; এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন ; এবং মাঝে মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের রূপান্তর বলিয়া কাহারো ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষুদ্র বাঙালিমূর্তি কি ধরা পড়ে না।

যাহা হউক, আমাদের স্কুলের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারো ভ্রম হইত না ; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁহার নাম যম ; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ বুঝা গিয়াছিল, নরদেবতার মতো বালাই আর নেই। সুরলোকবাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফুল পাড়িয়া দিলে খুশি হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চান অনেক

বেশি, এবং আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছুতেই দেবতার মতো দেখিতে হয় না।

বালকদের পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথপণ্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল, সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ। তিনি ছেলেদের নূতন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বৈ আর কিছুই নয় কিন্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশি ভালোবাসে ; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কী কষ্টই- না স্বীকার করে, এমন-কি, নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়। এমন-কি, যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া যায়, মানুষ বস্তুর চেয়ে অবস্তুরকে বেশি মূল্যবানগ্ধন করে, সোনার চেয়ে বানি, প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে।

মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় নিয়মবশত পণ্ডিতমহাশয় যখন শশিশেখরকে ভেটকি নাম দিলেন তখন সে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষত উক্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ করা হইতেছে জানিয়া তাহার মর্মযন্ত্রণা আরে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

আশুর নাম ছিল গিন্নি, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে।

আশু ক্লাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারা ভালোমানুষ ছিল। কাহাকেও কিছু বলিত না, বড়ো লাজুক ; বোধ হয় বয়সে সকলের চেয়ে ছোটো, সকল কথাতেই কেবল মৃদু মৃদু হাসিত ; বেশ পড়া করিত ; স্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সঙ্গে ভাব করিবার জন্য উন্মুখ ছিল কিন্তু সে কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, এবং ছুটি হইবামাত্রই মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত।

পত্রপুটে গুটিকতক মিষ্টান্ন এবং ছোটো কাঁসার ঘটতে জল লইয়া একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশু সেজন্য বড়ো অপ্রতিভ ; দাসীটা কোনোমতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচো সে-যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর-কিছু, এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড়ো অনিচ্ছুক। সেয়ে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সঙ্গীদের কাছে কোনোমতে প্রকাশ না হয়, এই তাহার একান্ত চেষ্টা।

পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার আর-কোনো ত্রুটি ছিল না, কেবল এক-একদিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথপণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারিত না। সেজন্য মাঝে মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। পণ্ডিত তাহাকে হাঁটুর উপর হাত দিয়া পিঠ নিচু করিয়া দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন ; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লজ্জাকাতর হতভাগ্য বালককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল। তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পণ্ডিতমহাশয় দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি স্নেট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলির মধ্যে পড়িবার বইগুলি জড়াইয়া লইয়া অন্যদিনের চেয়ে সংকুচিতভাবে আশু ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথপণ্ডিত শুষ্কহাস্য হাসিয়া কহিলেন, “এই-যে গিল্মি আসছে”

তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শোন, তোরা সব শোন”

পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণশক্তি সবলে বালককে নীচের দিকে টানিতে লাগিল ; কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেষ্টির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ঝুলাইয়া ক্লাসের সকল বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিন আশুর অনেক বয়স হইয়া থাকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখদুঃখলজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায়।

আশুর একটি ছোটো বোন আছে ; তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিংবা ভগিনী আর কেহ নাই, সুতরাং আশুর সঙ্গেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুদের বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল। জুতা হাতে করিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া যে দুই-চারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল, তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছুটিতে, গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পুতুলের বিয়ে। তাহারই আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ব্যস্ত হইয়া আশু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তর্ক উঠিল, কাহাকে পুরোহিত করা যায়। বালিকা চট করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ গা, তুমি আমাদের পুরুতঠাকুর হবে?”

আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথপণ্ডিত ভিজা ছাতা মুড়িয়া অর্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন ; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে পুতুলের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পণ্ডিতমশায়কে দেখিয়াই আশু তাহার খেলা এবং ভগিনী সমস্ত ফেলিয়া একদৌড়ে গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার ছুটির দিন সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গেল।

পরদিন শিবনাথপণ্ডিত যখন শুষ্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকাস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশুর “গিল্মি” নামকরণ করিলেন, তখন প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া চারি দিকের কৌতুক-হাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল ; এমন সময় একটা ঘন্টা বাজিল, অন্য- সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দুটি

মিষ্টান্ন ও বকবাকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

তখন হাসিতে হাসিতে তাহার মুখ কান টকটকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপণ্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে লাগিলেন--ছেলেরা পরমাহ্লাদে আশুকে ঘিরিয়া “গিনি গিনি” করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোটোবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর লোক কোনোকালেও যে সেদিনের কথা ভুলিয়া যাইবে, এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

১২৯৮ ?

রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা

যাহারা বলে, গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল, তখন জুপাকৃতি চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, “দুটো পান্তাভাত-যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া যায় না।”

এ দিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো!” গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও” রামকানাই কাগজকলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, “আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম” রামকানাই লিখিলেন- কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগ্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই-- এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সেই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জীব হস্তে যাহা সেই করিলেন, তাহা কতকগুলি কল্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পাস্তাভাত খাইয়া যখন স্ত্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাক্রোধ হইয়াছে দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল “মায়াকান্না”। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল-- বলিল, “মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে--”

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন-- এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে-- কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার যা-কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমত আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।”

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, “দেখিব মুখাণ্ণি কে করে-- এবং শ্রাদ্ধশাস্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।” গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ্ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রিশ্চান বলিত, সে জ্বিত কাটিয়া বলিত “রাম, আমি যদি ক্রিশ্চান হই তো গোমাংস খাই” জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সাস্তুনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবো। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, “বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্দুকে যতপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুই-চারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটা নূতন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্বাপর যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মতো অসংলগ্ন আকার ধারণ করিলা--

“ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো, লেখাটা কারা তোমার বুঝি ? ওগো, তেমন যত্ন করে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো--তোরা একটুকু থাম্, মেলা চেষ্টাস নে, কথাটা শুনতে দো ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো-- আমি কেন বেঁচে রইলুম” রামকানাই মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “সে আমাদের কপালের দোষ”

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়িসমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন-- অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, “আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই”

নবদ্বীপের মা ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, “না, তুমি বড়ো ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না ; দাদা বললেন “লেখো”, ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ঐ কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্ পোড়ামুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে-- আর আমার সোনার-চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, আমি শিগগির মরছি নে”

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচার আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোত্তর অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এই-সকল উৎকট কাল্পনিক আশঙ্কা নিবারণ-উদ্দেশ্যে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন, তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন তিনি সোনার নবদ্বীপকে বিষয়

হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভাবী দ্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, “কোনো ভাবনা নাই। এ-বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখন হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবো” নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিসুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না ; সুতরাং কথাটা তাঁরও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইলজালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে, তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয় ; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল, সে বলিল, “দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষ্য জুটাইব।”

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল, তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন-কি, কিঞ্চিৎ রসলাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, “গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।”

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “নেও নেও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন, একদিনের তরে তো মনে পড়ে নি।” ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন-- অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল-

- নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, “রমণীর মুখে মধু, হৃদয়ে ক্ষুর”- যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন, তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, “হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল-যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায় উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।”

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “তোরা এ কি সর্বনাশ করিয়াছিস!” গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, “কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী! সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!”

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহস্তী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মস্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতৃপুত্র সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়!

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জনগর্জন কখনো-বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন-- আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপে দুইদিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী

যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কগুষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন-- বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, “হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে

উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা” এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, “বাই জোভ! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।”

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, “বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল-- আমার সাক্ষ্য মকদ্দমা রক্ষা পায়।”

দিদি বলিলেন, “বটে! লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভালো বলে জানতুম।”

কারারুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে ; সাক্ষীর বাস্তব মध्ये উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখতে পারে নাই ; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার-জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল ; আত্মীয়দের

মধ্যে কেহ কেহ কহিল, “আর কিছুদিন পূর্বে গেলেই ভালো হইত”--কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

১২৯৮ ?

ব্যবধান

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশুমালী উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই ; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে। কিন্তু ইহাদের দুই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজন্য ইহাদের সম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশুর চেয়ে অনেক বড়ো। হিমাংশুর যখন দস্ত এবং বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই, তখন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কান্না থামাইয়াছে, ঘুম পাড়াইয়াছে এবং শিশুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক লোকদিগকে সবেগে শিরশ্চালন, তারস্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে-সকল বয়সানুচিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম প্রকাশ করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে ত্রুটি করে নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড়ো-একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের শখ ছিল এবং এই দূরসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল। ইহাকে খুব একটি দুর্লভ দুর্মূল্য লতার মতো বনমালী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিঞ্চন করিয়া পালন করিতেছিল এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তরবাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বনমালী আপনাকে ধন্যঞ্জন করিল।

এমন সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু এক-একটি স্বভাব আছে যে, একটি ছোটো খেয়াল কিংবা একটি ছোটো শিশু কিংবা একটি অকৃতজ্ঞ বন্ধুর নিকটে অতি সহজে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করে ; এই বিপুল পৃথিবীতে একটিমাত্র ছোটো স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তার পরে হয়তো সামান্য উপস্থিত্তে পরম সন্তোষে জীবন কাটাইয়া দেয় কিংবা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশুর বয়স যখন আর-একটু বাড়িল, তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিস্তারিত তারতম্যসত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোটোবড়ো কিছু ছিল না।

এইরূপ হইবার একটু কারণও ছিল। হিমাংশু লেখাপড়া করিত এবং স্বভাবতই তাহার ধ্যানমগ্নতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই পড়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, চারি দিকেই তাহার মনের একটি পরিণতিসাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একটু শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথা শুনিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোটোবড়ো সকল কথার আলোচনা করিত, কোনো বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হৃদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মানুষ করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বুদ্ধি, ধ্যান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয়, তবে তাহার মতো এমন পরমপ্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের শখও হিমাংশুর ছিল। কিন্তু এ-বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের শখ, হিমাংশুর ছিল বুদ্ধির শখ। পৃথিবীর এই কোমল গাছপালাগুলি, এই অচেতন জীবনরাশি, যাহারা যত্নের কোনো লালসা রাখে না অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগুলির মতো বাড়িয়া উঠে, যাহারা মানুষের শিশুর চেয়েও শিশু, তাহাদিগকে সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশুর গাছপালার প্রতি একটি কৌতূহলদৃষ্টি ছিল। অঙ্কুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দেয়, কুঁড়ি ধরে, ফুল ফুটিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজবপন, কলম করা, সার দেওয়া, চানকা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখণ্ডটুকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যতপ্রকার সংযোগবিয়োগ সম্ভব, তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

দ্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেদির মতো ছিল। চারটে বাজিলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর

ফেলিয়া, গুড়গুড়ি লইয়া, বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বসিত। কোনো বন্ধুবান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিংবা খবরের কাগজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো-বা দক্ষিণে কখনো বামে দৃষ্টিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গুড়গুড়ির বাষ্পকুণ্ডলীর মতো ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘুভাবে উড়িয়া যাইত, ভাঙিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোনো চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যখন হিমাংশু স্কুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া হাতমুখ ধুইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনই তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যাইত, এতক্ষণ ধৈর্যসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দুইজনে বেষ্ণের উপর বসিত-- দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত ; কোনোদিন-বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগুলি ছবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগুলি জ্বলিতে থাকিত।

হিমাংশু কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শুনিত। যাহা বুঝিত না, তাহাও তাহার ভালো লাগিত ; যেসকল কথা আর-কাহারো নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তিজনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশুর মুখে বড়ো কৌতুকের মনে হইত। এমন শ্রদ্ধাবান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত। সে কতক-বা পড়িয়া বলিত, কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা উপস্থিতমত তাহার মাথায় জোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনায় সহায়তায়ঞ্চনের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত, অনেক বেঠিক কথাও বলিত, কিন্তু বনমালী গভীরভাবে শুনিত, মাঝে মাঝে দুটো-একটা কথা বলিত, হিমাংশু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বুঝাইত তাহাই বুঝিত, এবং তাহার পরদিন ছায়ায় বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই-সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিনেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে যে গালাগালি বর্ষিত হয়, তাহাতে যদি কিছুমাত্র বন্ধু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল, সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল, ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের জিত হইল ; প্রমাণ হইয়া গেল, নালা তাহারই এবং পাতিনেবুতে আর-কাহারো কোনো অধিকার নাই। আপিল হইল কিন্তু নালা এবং পাতিনেবু হরচন্দ্রেরই রহিল।

যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল, দুই ভাইয়ের বন্ধুত্বে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন-কি, পাছে বিবাদের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় কাতর হইয়া বনমালী দ্বিগুণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশুকে হৃদয়ের কাছে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, এবং হিমাংশুও লেশমাত্র বিমুখভাব প্রকাশ করিত না।

যেদিন আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল, সেদিন বাড়িতে বিশেষত অন্তঃপুরে পরম উল্লাস পড়িয়া গেল, কেবল বনমালীর চক্ষে ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অবরাহ্ণে সে এমন স্নানমুখে সেই বাগানের বেদিতে গিয়া বসিল, যেন পৃথিবীতে আর-কাহারো কিছু হয় নাই, কেবল তাহারই একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।

সেদিন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া

দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়া-কাপড় ঝুলিতেছে ; অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল-- হিমাংশু বাড়িতে আছে। গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া দিয়া বিষণ্ণমুখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর বাড়িতে গেল।

গোকুলচন্দ্র দ্বারের কাছে বসিয়া তপ্ত দেহে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, “কে ও?”

বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “মামা, আমি।”

মামা বলিলেন, “কাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছ বাড়িতে কেহ নাই।”

বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল হিমাংশুদের বাড়ির জনলাগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল ; দরজার ফাঁক দিয়া যে-দীপালোকরেখা দেখা যাইতেছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রি বনমালীর মনে হইল, হিমাংশুদের বাড়ির সমুদয় দ্বার তাহারই নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পরদিন বাগানে আসিয়া বসিল, মনে করিল, আজ হয়তো আসিতেও পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত, সে-যে একদিনও আসিবে না, এ কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখনো মনে করে নাই, এ বন্ধন কিছুতেই ছিঁড়িবে ; এমন নিশ্চিত্তমনে থাকিত যে, জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ কখন সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আজ সহসা জানিল সেই বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, কিন্তু একমুহূর্তে-যে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত, যদি দৈবক্রমে আসে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, যাহা নিয়মক্রমে প্রত্যহ ঘটিত, তাহা দৈবক্রমেও একদিন ঘটিল না।

রবিবারদিনে ভাবিল, পূর্বনিয়মমত আজও হিমাংশু সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবো। ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয় কিন্তু তবু আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল, সে আসিল না।

তখন বনমালী বলিল, “তবে আহার করিয়া আসিবে”। আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল, “আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে ঘুম ভাঙিলেই আসিবে” ঘুম কখন ভাঙিল জানি না, কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, হিমাংশুদের দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগুলি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহের সাতটা দিনই যখন দুরদৃষ্ট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আশ্রয় দিবার জন্য যখন আর একটা দিনও বাকি রইল না, তখন হিমাংশুদের রুদ্ধদ্বার অট্টালিকার দিকে তাহার অশ্রুপূর্ণ দুটি কাতর চক্ষু বড়ো-একটা মর্মভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আত্মস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, “দয়াময়!”

১২৯৮ ?

তারাপ্রসন্নের কীর্তি

লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুঁজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না, এইজন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে একটা উজবুক রকমের মনে করিত এবং লোকেরও দোষ দেওয়া যায় না। মনে করো, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারাপ্রসন্নকে বলিলেন, “মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কী পর্যন্ত আনন্দ লাভ করা গেল, তা একমুখে বলতে পারি নে”-- তারাপ্রসন্ন নিরন্তর হইয়া নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সে নীরবতার অর্থ এইরূপ মনে হয়, “তা, তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খুব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার-যে আনন্দ হয়েছে এমন মিথ্যা কথাটা কী করে মুখে উচ্চারণ করব তাই ভাবছি”

মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্থামী যখন সায়াহ্নের প্রাক্কালে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন এবং মধ্যে মধ্যে বিনীত কাকুতিসহকারে ভোজ্যসামগ্রীর অকিঞ্চিৎ-করত্ব সম্বন্ধে তারাপ্রসন্নকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে থাকেন, “এ কিছুই না। অতি যৎসামান্য। দরিদ্রের খুদকুঁড়া, বিদুরের আয়োজন। মহাশয়কে কেবলই কষ্ট দেওয়া”- তারাপ্রসন্ন চুপ করিয়া থাকেন, যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে মধ্যে এমনও হয়, কোনো সুশীল ব্যক্তি যখন তারাপ্রসন্নকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার মতো অগাধ পাণ্ডিত্য বর্তমানকালে দুর্লভ এবং সরস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপূর্বক তারাপ্রসন্নের কণ্ঠাগ্রে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তারাপ্রসন্ন তাহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন না, যেন সত্য

সত্যই সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। তারাপ্রসন্নের এইটে জানা উচিত যে, মুখের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আত্মনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসংকোচে অত্যাধিকার করিয়া থাকে-- অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অস্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে, তবে বক্তা আপনাকে প্রতারণিতপন্ন করিয়া বিষম ক্ষুব্ধ হয়। এইরূপ স্থলে লোকে নিজের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসন্নের ভাব অন্যরূপ ; এমন-কি, তাঁহার নিজের স্ত্রী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথায় কথায় বলেন, “নেও নেও, আমি হার মানলুম। আমার এখন অন্য কাজ আছে” বাগ্যুদ্ধে স্ত্রীকে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে, এমন ক্ষমতা এবং এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে।

তারাপ্রসন্নের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নাই এবং সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না ; শুনিয়া তারাপ্রসন্ন বলিতেন, “তোমার একটি বৈ স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবো” শুনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না-- স্বামীর সে-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তারাপ্রসন্ন যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে মাঝে স্বামীর লেখা শুনিতেন, যতই না বুঝিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন। তিনি কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে-সমস্তই জলের মতো বুঝা যায়, এমন-কি, নিরক্ষর লোকও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দুর্যোধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্বে কোথাও দেখেন নাই।

তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যখন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর বুঝিতে পারিবে না, তখন দেশসুদূর লোক বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন, “এসেব লেখা ছাপাও”

স্বামী বলিতেন, “বই ছাপানো সম্বন্ধে ভগবান মনু স্বয়ং বলে গেছেন : প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং নিবৃত্তিস্থ মহাফলা”

তারাপ্রসঙ্গের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন। যে স্বামী কথায় কথায় এমনসেকল দুরূহ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা বৈ আর সন্তান হয় না, স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কী দিবা।

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বক্ষের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন তারাপ্রসঙ্গের নিশ্চিন্তভাব ঘুচিয়া গেল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, একে একে চারিটি কন্যারই বিবাহ দিতে হইবে, এবং সেজন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গৃহিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্তমুখে বলিলেন, “তুমি যদি একবার একটুখানি মন দাও, তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।

তারাপ্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “সত্য নাকি। আচ্ছা, বলো দেখি কী করিতে হইবে।”

দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, “কলিকাতায় চলো, তোমার বইগুলো ছাপাও, পাঁচজন লোকে তোমাকে জানুক-- তার পরে দেখো দেখি, টাকা আপনি আসে কি না।”

স্ত্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসঙ্গও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন এবং মনে প্রত্যয় হইল, তিনি ইস্তক-নাগাদ বসিয়া যত লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াসুদূর লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নিরুপায় নিঃসহায় সযত্নপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে

পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অনভিজ্ঞ স্বামীও অপরিচিত বিদেশে স্ত্রীকন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত ভীত ও অসম্মত। অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য-অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদুলিতাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসন্ন তাঁহার চতুর সঙ্গীর সাহায্যে “বেদান্তপ্রভাকর” প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে-টাকাক’টি পাইয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্রয়ের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোটো বড়ো সমস্ত সম্পাদকের নিকট “বেদান্তপ্রভাকর” পাঠাইয়া দিলেন। ডাকযোগে গৃহিণীকেও একখানা বই রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশঙ্কা ছিল, পাছে ডাকওয়ালারা পথের মধ্য হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যেদিন ছাপার বইরের উপরের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন, সেদিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বসিবার কথা, সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। “ওমা, বইটা ওখানে কে ফেলে রেখেছে! অন্নদা, বইটা দাও-না ভাই, তুলে রাখি” উহাদের মধ্যে অন্নদা পড়িতে জানে। বইটা কুলঙ্গির উপর তুলিয়া রাখিলেন।

মুহূর্তপরে একটা জিনিস পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন-- তার পরে নিজের বড়োমেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শশী, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি? তা নে-না মা, পড়-না। তাতে লজ্জা কী” বাবার বহির প্রতি শশীর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই তাকে ভর্তসনা করিয়া বলিলেন, “ছি মা, বাবার বই অমন করে নষ্ট করতে নেই, তোমার কমলাদিদির হাতে দাও, উনি ঐ আলমারির মাথায় তুলে রাখবেন”

বহির যদি কিছুমাত্র চেতনা থাকিত, তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদান্তের প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগজে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী যাহা ঠাहरাইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর বুঝিতে না পারিয়া দেশসুন্দর সমালোচক একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে কহিল, “এমন সারবান গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই”

যে-সকল সমালোচক রেনল্ড্‌সের লণ্ডনরহস্যের বাংলা অনুবাদ ছাড়া আর-কোনো বই স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লিখিল, “দেশের ঝুড়ি ঝুড়ি নাটকনবেলের পরিবর্তে যদি এমন দুই-একখানি গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে বাহির হয়, তবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়”

যে ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে বেদান্তের নাম কখনো শুনে নাই সেই কেবল লিখিল, “তারাপ্রসন্নবাবুর সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই-স্থানাভাববশত এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়” কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইব্রেরি ছিল এবং ছিল না, তাহার সম্পাদকগণ মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রাক্ষিত পত্রে তারাপ্রসন্নের গ্রন্থ ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল, “আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে” চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে, তারাপ্রসন্ন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু পুলকিতচিত্তে ঘর হইতে মাসুল দিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরিতে “বেদান্তপ্রভাকর” পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপ অজস্র স্তুতিবাক্যে তারাপ্রসন্ন যখন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তানসম্ভাবনা অতি

নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একখানি বইও বিক্রয় হয় নাই। কেবল এক জায়গায় শুনিলেন, মফস্বল হইতে কে-একজন তাঁহার এই বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে ভ্যালুপেবেলে পাঠানোও হইয়াছিল, কিন্তু বই ফেরত আসিয়াছে, কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাসুল দণ্ড দিতে হইয়াছে, সেইজন্যে সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তখনই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে-কয়েকটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখানি “গৌড়বার্তাবহ” আনিয়া গৃহিণীর ক্রোড়ে মেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে মনে সম্পাদকের অক্ষয় ধনপুত্র কামনা করিলেন ; এবং তাঁহার লেখনীরী মুখে মানসিক পুষ্পচন্দন-র অর্থ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তখন “নবপ্রভাত” আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখণ্ড “যুগান্তর” বাহির করিলেন। তাহার পর ? তাহার পর “ভারতভাগ্যচক্র”। তাহার পর ? তাহার পর “শুভজাগরণ”। তাহার পর “অরুণালোকে”, তাহার পর “সংবাদতরঙ্গভঙ্গ”। তাহার পর-- আশা, আগমনী, উচ্ছ্বাস, পুষ্পমঞ্জরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, অহল্যালাইব্রেরী-প্রকাশিকা,

ললিত সমাচার, কোটাল, বিশ্ববিচারক, লাণ্যলতিকা। হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর আনন্দশ্রুতি পড়িতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া আর-একবার স্বামীর কীর্তি-রশ্মিসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন-- স্বামী বলিলেন, “এখনো অনেক কাগজ বাকি আছে”

দাক্ষায়ণী বলিলেন, “সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কী বলো”

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, “এবার কলিকাতায় গিয়া শুনিয়া আসিলাম লাটসাহেবের মেম একখানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেদান্তপ্রভাকরের কোনো উল্লেখ করে নাই”

দাক্ষায়ণী বলিলেন, “আহা, ও-সব কথা নয়-- আর কী আনলে বলো-না” তারাপ্রসন্ন বলিলেন, “কতকগুলো চিঠি আছে”

তখন দাক্ষায়ণী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, “টাকা কত আনলো” তারাপ্রসন্ন বলিলেন, “বিধুভূষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত করে এনেছি”

অবশেষে দাক্ষায়ণী যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন পৃথিবীর সাধুতা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারেরা তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবশেষে সহসা মনে হইল, যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া স্বামীর সহিত পাঠাইয়াছিলেন সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে-- এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, ওপাড়ার বিশ্বস্তর চাটুজ্যে তাঁহার স্বামীর পরম শত্রু, নিশ্চয়ই এ-সমস্ত তাঁহারই চক্রান্তে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যেদিন তাঁহার স্বামী কলিকাতায় যাত্রা করেন, তাহার দুই দিন পরেই বিশ্বস্তরকে বটতলায় দাঁড়ইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল-- কিন্তু বিশ্বস্তর মাঝে মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবার্তা কয় না কি, এইজন্যে তখন কিছু মনে হয় নাই, এখন সমস্ত জলের মতো বুঝা যাইতেছে।

এ দিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থসংগ্রহের এই একমাত্র সহজ উপায় নিষ্ফল হইল তখন আপনার কন্যাপ্রসবের অপরাধ তাঁহাকে চতুর্গুণ দন্ধ করিতে লাগিল। বিশৃঙ্খল, বিধুভূষণ অথবা বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না-- সমস্তই একলা নিজের স্ফক্ষে তুলিয়া লইতে হইল, কেবল যে মেয়েরা জন্মিয়াছে এবং জন্মিবে তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিলেন। অহোরাত্র মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে আর শান্তি রহিল না।

আসন্নপ্রসবকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলের বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় তারা প্রসন্ন পাগলের মতো হইয়া বিশৃঙ্খলের কাছে গিয়া বলিল, “দাদা, আমার এই খানপঞ্চাশেক বই বাঁধা রাখিয়া যদি কিছু টাকা দাও তো আমি শহর হইতে ভালো দাই আনাই।”

বিশৃঙ্খল বলিল, “ভাই, সেজন্য ভাবনা নাই, টাকা যাহা লাগে আমি দিব, তুমি বই লইয়া যাও।” এই বলিয়া কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধুভূষণ স্বয়ং গিয়া নিজে হইতে পাথেয় দিয়া কলিকাতা হইতে ধাত্রী আনিল।

দাক্ষায়ণী কী মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, “যখনই তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিয়ো না। আর, সেই সন্ন্যাসীর মাদুলিটা কখনোই খুলিয়া রাখিয়ো না।” আর এমন ছোটোখাটো সহস্র বিষয়ে স্বামীর দুটি হাতে ধরিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধুভূষণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর সর্বনাশ করিয়াছে। নতুবা ঔষধ মাদুলি এবং মাথার দিব্য-সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তার পরে মহাদেবের মতো তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে পৃথিবীর নির্মম কুটিলবুদ্ধি চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষে চুপি চুপি বলিলেন, “দেখো, আমার যে মেয়েটি হইবে, সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিয়ো “বেদান্তপ্রভা”, তার পরে তাহাকে শুধু প্রভা বলিয়া ডাকিলেই চলিবে।”

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন। মনে মনে কহিলেন, “কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুচিল।”

ধাত্রী যখন বলিল, “মা, একবার দেখো, মেয়েটি কী সুন্দর হয়েছে”-- মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন “বেদান্তপ্রভা”। তার পরে ইহসংসারে আর-একটি কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

১২৯৮ ?

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি, লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিহ্ন হিপিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন ; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে, এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসাতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমনি-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ

স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, ‘মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবো’

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টলমল করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার — এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ‘মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন’। বাস্তবিক, শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেলা পাড়

ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, ‘চন্ন, ফু’

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুপ্ত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই ; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নের প্রবৃত্তি হইল না তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, ‘দেখো দেখো ওই দেখো পাখি ঐ উড়ে এ গেল। আয় রে পাখি আয় আয়’ এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিক ক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, ‘তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না’ বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব-বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু, ঐ-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্‌ ছল্‌ছল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাतीরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারো কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধৌওয়ার মতো হইয়া

আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, ‘বাবু খোকাবাবু লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার’

কিন্তু চন্ম বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না ; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় ‘বাবু’ ‘খোকাবাবু আমার’ বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া

মাঠাকরনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, ‘জানি নে মা’

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে ; এমনকি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, ‘তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে তুই যত টাকা চাস তোকে দেবা’ শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, ‘কেনা তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।’

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই, তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদেহ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই

মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না — যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল, ‘তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই, সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে’

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্‌ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল — আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, ‘আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে’ তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলো। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিলা। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না ; রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জ্যোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ব্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, ‘বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না’

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হুটপুট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ-- কেশবশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালোপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে-- তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরো। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়-- কিন্তু, যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ষিক্যের ওজন সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁতখুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, ‘আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি’ এই বলিয়া বারাসাতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বন্ধের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কত্ৰী একটি সন্ধ্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহু মূল্যে একটি শিকড় ও আশীৰ্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময়ে প্রাপ্তনে শব্দ উঠিল ‘জয় হোক মা’।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে রো’

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ‘আমি রাইচরণ’

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ স্তান হাস্য করিয়া কহিল, ‘মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই’

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না ; রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, ‘প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি--’

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, ‘বলিস কী রো কোথায় সে’

‘আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশু আনিয়া দিবা’

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া, তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ-- বেশভূষা আকারপ্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কোনো প্রমাণ আছে?’

রাইচরণ কহিল, ‘এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবো আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।’

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবো এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবো।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত এবং রাইচরণকে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, ‘কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।’

রাইচরণ করজোড়ে গদগদ কণ্ঠে বলিল, ‘প্রভু বৃদ্ধ বয়সে কোথায় যাইব।’

কর্ত্তী বলিলেন, ‘আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।’

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, ‘যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।’

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, ‘আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।’ নিজের পাপ ঈশ্বরের স্বক্ষে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ‘যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।’ রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, ‘সে আমি নয় প্রভু।’ ‘তবে কো’ ‘আমার অদৃষ্ট।’ কিন্তু এরূপ বৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না। রাইচরণ বলিল, ‘পৃথিবীতে আমার আর-কেহ নাই।’

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, ‘বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও’

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল ; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

১২৯৮

সম্পত্তি-সমর্পণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুণ্ড মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, ‘আমি এখনই চলিলাম।’

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, ‘বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহার পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখোনা।’

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশনবসনের প্রথা তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত বেশভূষা-আহারবিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে যতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়া-পরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশি আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্ম-ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর পার্শ্বব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়া-কালে কবিরাজ বহুবায়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন প্রথমে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল,

কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।

বাপ বলিলেন, ‘কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না ? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা-বাদশারা মরে কোন্ দুঃখে! যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে।’

বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিন্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরেজের নূতন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার নব্য বৃন্দাবন প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, ‘আমি চলিলাম।’

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনো এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরাক্ষপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধন-গ্রহণ মাতৃরক্তপাতের তুল্য পাতক বলিয়া স্বীকার করিল। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটোখাটো বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষত, যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল এ কালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল ; বলিল, একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমার

বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশুস্ত হইত।

বৃন্দাবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে এক তো ব্যয়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপর যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দূর হইল, বৃন্দাবন কখন তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে এই আশঙ্কা তাঁহার সর্বদাই ছিল-- যে অত্যাশ্রয় আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্বদা লিপ্ত হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারি বৎসর-বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়া-পরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্তের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল ; উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু শূন্য গৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুশকিল হইয়াছে, পূজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিন্তা ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে ; বিশেষত বিছানায় কাঁথায় তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদুরে উক্ত শিল্প-অঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরো অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধুতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল ; এক্ষণে তাহার শয়নগৃহে সেই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল ; সেটি পলিতাপ্রেক্ষিত-করণ কিম্বা অন্য

কোনো গার্হস্থ্য ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্বক সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন-কি, বৎসরে একখানি করিয়া ধুতিও নষ্ট করে তথাপি তাকে তিরস্কার করিবে না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল এবং শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমন-কি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারাশ্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুঁকা-হস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগপূর্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবি-রচিত বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বুড়োরা তাঁহাকে ‘যজ্ঞনাশ’ বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে ‘চামটিকে’ বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্মের সহিত উক্ত খেচরের কোনোপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন এইরূপে আশ্রিতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে, অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিএর বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত এ তাহা না করিয়া চট্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া

অরুণ্যভিমুখে পলায়ন করিল-- আকস্মিক ভ্রাসে বৃদ্ধের সর্বশরীর কন্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছু দূর যাইতে-না-যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগড়ির আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মাণবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারি সমুদ্র হইলেন। কোনো বালকের নিকট হইতে এরূপ অসংকোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামত আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমার নাম কী’

সে বলিল, ‘নিতাই পাল’

‘বাড়ি কোথায়’

‘বলিব না’

‘বাপের নাম কী’

‘বলিব না’

‘কেন বলিবে না’

‘আমি বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি’

‘কেন’

‘আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়’

এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়-বুদ্ধিহীনতার পরিচয় তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন, ‘আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?’

বালকটি কোনো আপত্তি না করিয়া এমনই নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবর্তী তরুতল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এমনই অস্বাভাবিকতায় নিজের অভিপ্রায়মত আদেশ প্রচার করিতে লাগিল যেন পূর্বাচ্ছেই তাহার পুরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমত ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ, কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশি দিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বুকুর পাঁজরের মতো ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, ‘ভাই, তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়া যাইবা’ বালকের বয়স অল্প, কিন্তু এই আশ্বাসের মর্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, ‘আহা, বাপ-মা’র মনে না-জানি কত কষ্টই হইতেছে ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়!’

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশ্যে অকথ্য-উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি বাঁজ যে, ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশি অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে।

নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল ; ভাবী বিষয়-আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারম্বার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, ‘তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না’

বালকের ভারি কৌতূহল হইল ; কহিল, ‘কোথায় দেখাইয়া দাও-না’

যজ্ঞনাথ কহিলেন, ‘এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইবা’

নিতাই এই নূতন রহস্য-আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিল। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। ভারি মজা। বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না, সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে বলিল, ‘চলো’

যজ্ঞনাথ বলিলেন, ‘এখনো রাত্রি হয় নাই’

নিতাই আবার কহিল, ‘রাত্রি হইয়াছে দাদা, চলো’

যজ্ঞনাথ কহিলেন, ‘এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই’

নিতাই মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়াই কহিল, ‘এখন ঘুমাইয়াছে, চলো’

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রাসম্বরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে যতগুলো কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে

যোগ দিলা মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে ব্রজ হইয়া ঝটপট করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেলা নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, ‘এইখানে?’

যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃ-গৃহত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও লুকোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিলেন। বালক দেখিল নিম্নে একটা ঘরের মতো এবং সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতূহল হইল, সেইসঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল চারি দিকে পিতলের কলস। মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর, চন্দন, ফুলের মালা, পূজার উপকরণ। বালক কৌতূহল-নিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিলেন, ‘নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিবা আমার অধিক কিছু নাই, সবে এই ক’টি মাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিবা’

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, ‘সমস্তই! ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?’

‘যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিম্বা তাহার ছেলে কিম্বা তাহার পৌত্র কিম্বা তাহার প্রপৌত্র কিম্বা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিম্বা তাহাদের হাতে এই-সমস্ত টাকা গনিয়া দিতে হইবো’

বালক মনে করিল, যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল,
'আচ্ছা'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'তবে এই আসনে বইসা'

'কেনা'

'তোমার পূজা হইবো'

'কেনা'

'এইরূপ নিয়ম'

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিলেন, সিঁদুরের টিপ দিয়া দিলেন, গলায় মালা দিলেন ; সম্মুখে বসিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল ; ডাকিল,
'দাদা'

যজ্ঞনাথ কোনো উত্তর না করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটি ঘড়া বহু কষ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন, 'যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিম্বা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিম্বা তাহার বংশের ন্যায় উত্তরাধিকারীকে এই-সমস্ত টাকা গনিয়া দিবা'

এইরূপ বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলোটো হতবুদ্ধির মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, হাত-পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ স্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেলা। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া কহিল, ‘দাদা, কোথায় যাও’

যজ্ঞনাথ কহিলেন, ‘আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্-- তোকে আর কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।’

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহুকষ্টে বলিল, ‘দাদা, আমি বাবার কাছে যাব।’

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিলেন নিতাই আর একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, ‘বাবা’ তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না। যজ্ঞনাথ এইরূপে যক্ষের হস্তে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন।

তাহার উপরে ভাঙা মন্দিরের ইঁট বালি জুপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু কিছুতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল, যেন অনেক দূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শয্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে যেন এমনি করিয়া কোনোমতে পৃথিবীর মুখ চাপা দিতে চাহে। ঐ কে ডাকে ‘বাবা’।

বৃদ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, ‘চুপ কর। সবাই শুনিতে পাইবো’

আবার কে ডাকে ‘বাবা’।

দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল।

সেখানেও কে ডাকিল, ‘বাবা’ যজ্ঞনাথ সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল, ‘বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকাইয়া আছে, তাহাকে দাও’

বৃদ্ধ চোখ মুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, ‘তোমার ছেলে?’

বৃন্দাবন কহিল, ‘হাঁ গোকুল-- এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্তন করিয়াছি, নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না’

বৃদ্ধ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাড়াইতে হাড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেল। কহিল, ‘কান্না শুনিতে পাইতেছ?’

বৃন্দাবন কহিল, ‘না’

‘কান পাতিয়া শোনো দেখি বাবা বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?’

বৃন্দাবন কহিল, ‘না’

বৃদ্ধ তখন যেন ভারি নিশ্চিত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, ‘কান্না শুনিতে পাইতেছ?’

পাগলামির কথা শুনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বৎসর চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারি দিক হাড়াইয়া মুমূর্ষু কহিল, ‘নিতাই আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে’

সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহুর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া
আবার সে ধুপ্ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলায়
যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানে অন্তর্হিত হইল।

দালিয়া

ভূমিকা

পরাজিত শা সুজা ঔরঞ্জীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপুত্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরেন। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায়, এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্ধৃত হয় এবং তাহারই গৃহে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভর্তসনা করিয়া কহিল, ‘তিনি’

ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল-- ‘তিনি, আজ সকালে তোর হইল কী। কাজকর্মে যে একেবারে হাত লাগাস নাই আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো--’

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল, ‘বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি’

‘তোর আবার দিদি কে রে তিনি’

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, ‘আমি’

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। তার পর জুলিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুই কাজ-কাম কিছু জানিস?’

আমিনা কহিল, ‘বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না’

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুই থাকিবি কোথায়’

জুলিখা বলিল, ‘আমিনার কাছে’

বৃদ্ধ ভাবিল, এও তো বিষম বিপদ। জিজ্ঞাসা করিল, ‘খাইবি কী’

জুলিখা বলিল ‘তাহার উপায় আছে’-- বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল, ‘বুঢ়া, আর-কোনো কথা কহিস না। তুই কাজে যা, বেলা হইয়াছে’

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কী করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছদ্মনামে আরাকান রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাতবায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পরিতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল, ‘ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য নহিলে আর তো কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না’

আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী, সর্বাপেক্ষা ছায়াময় বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, ‘দিদি, আর ও-সব কথা বলিস নে ভাই! আমার এই পৃথিবীটা একরকম বেশ লাগিতেছে মরিতে চায় তো পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোনো দুঃখ নাই’

জুলিখা বলিল, ‘ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লির সিংহাসন আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির’

আমিনা হাসিয়া কহিল, ‘দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে তাহাতে দিল্লির সিংহাসন এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না’

জুলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল, ‘তা তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোটো ছিলি-- কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ পিতা তোকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয়ঞ্চন করিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে’

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নবযৌবন এবং কী-একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ‘দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা করো ভাই, আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাখিয়া দিলে বুঢ়া খাইতে পাইবে না’

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারি বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধূপ্ করিয়া একটা লক্ষ্মের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জুলিখা ত্রস্ত হইয়া কহিল, ‘কেও’

স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অশ্লানবদনে কহিল, ‘তুমি তো তিন্মি নও’ যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে ‘তিন্মি’ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জুলিখা বসন সম্বরণ করিয়া দৃষ্টভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষুে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে তুমি’

যুবক কহিল, ‘তুমি আমাকে চেন না তিন্মি জানো তিন্মি কোথায়’

তিন্মি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, দিদি, ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ও কি মানুষ, ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদপি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিবা-- দালিয়া, তুমি কী করিয়াছিলো’

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল, ‘চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্মি কিন্তু ও তো তিন্মি নয়’

তিন্মি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল, ‘ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা! কবে তুমি তিন্মির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নয়’

যুবক কহিল, ‘চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না ; বিশেষত পূর্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্মি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম’

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, ‘না, তুমি অতি বর্বর, শাহজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। দেখো, এমনি করিয়া সেলাম করো।’

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গিতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহুকষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল, ‘এমনি করিয়া তিন পা পিছু হঠিয়া আইস।’ যুবক পিছু হঠিয়া আসিল।

‘আবার সেলাম করো।’ আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছু হঠাইয়া, সেলাম করাইয়া, আমিনা যুবককে কুটিরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল।

কহিল, ‘ঘরে প্রবেশ করো।’ যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, ‘একটু ঘরের কাজ করো। আগুনটা জ্বালাইয়া রাখো।’ বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, ‘দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মানুষগুলো এইরকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।’

কিন্তু আমিনার মুখে কিস্থা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, ‘বাস্তবিক আমিনা, তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি, একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড়ো তাহার সাহস।’

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, ‘দেখ্ দেখি বোনা যদি কোনো বাদশাহ কিম্বা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম’

জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না ; হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ‘সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে, সে কি ঐ বর্বর যুবকটার জন্য’

আমিনা কহিল, ‘তা সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি-- দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে, এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এইরকম ; দু-ঘা মারিলে ভারি খুশি হইয়া উঠে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ দেখো-না, ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি-- বড়ো আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বল্ তো বোনা আমি তো আর পারিয়া উঠি না’

জুলিখা কহিল, ‘আমি চেষ্টা দেখিতে পারি’

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, ‘তোর দুটি পায়ে পড়ি বোনা ওকে আর তুই কিছু বলিস না’

এমন করিয়া বলিল, যেন ঐ যুবকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই-- পাছে অন্য কোনো মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, আজ দালিয়া আসে নাই তিন্মি ?’

‘আসিয়াছে’

‘কোথায় গেল’

‘সে বড়ো উপদ্রব করিতেছিল, তাই তাহাকে ঐ ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি’

বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, ‘যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক থলু দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।’ (থলু অর্থে স্বর্ণমুদ্রা)

আমিনা কহিল, ‘ভাবনা নাই বুঢ়া, আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।’

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সম্মেনহ হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে, ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর-এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু, সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তরু মুঞ্জরিত হইতেছে ; এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে ; পাখির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই ; এবং দক্ষিণবায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অটালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে এখানে কিছু দিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবনির্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর-কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্বরকুটিরের মধ্যে নির্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব আপনাই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত

কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড়ো আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদিন যুবকের অসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে চিত্রকর নিজের সদ্য-সমাপ্ত ছবি দ্বয়ং দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে তেমনি করিয়া সন্মেনহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভর্ৎসনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়েই কাহারো নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহারাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিতান্ত কিংবর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্বর দালিয়া প্রকৃতি-সম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসংকুচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার জুলিখার হৃদয়টা হায়-হায় করিয়া উঠিত ; ভাবিত, সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল, ‘দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার ?’

‘পারি কেন বলো দেখি’

‘আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাই’

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল ; যেন এতবড়ো মজার কথা সে ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই-- যদি পরিহাস বলো তো এই বটে, রাজপুত্রীর উপযুক্ত কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধখানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যবহারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদ্ভিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিনই রহমত শেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, ‘আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন-- তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না’

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, ‘ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে-- এখন আর খেলা ভালো দেখায় না’

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল ; দেখিল সে সর্কৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্মাহত হইয়া কহিল, ‘জান দালিয়া ?-- আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি’

দালিয়া হাসিয়া বলিল, ‘সে তো বেশিক্ষণের জন্য নয়’

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিন্তে মনে মনে ভাবিল, ‘বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা আমারই পাগলামি’

আমিনা দালিয়াকে আর একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল,
‘রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিবা’

দালিয়া কথাটা সংগতধ্বন করিয়া কহিল, ‘ফেরা কঠিন বটে’

আমিনার সমস্ত অন্তরাআ একেবারে স্ফূর্ত হইয়া গেল।

জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ‘দিদি, আমি প্রস্তুত আছি’

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভান করিয়া কহিল,
‘রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া
অপরাধে শাস্তি দিবা তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিবা’

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত
হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী পদাতিক নিশান হস্তী বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর-দুয়ার
ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জুলিখার হাত হইতে ছুরিখানি লইল। তাহার হস্তিদন্তনির্মিত
কারুক্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্ঘাটন করিয়া নিজের
বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমুকুলের বস্তুর কাছে
ছুরিটি একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটিকে খাপের মধ্যে পুরিয়া বসনের মধ্যে
লুকাইয়া রাখিল।

একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাত্রার পূর্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়,
কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই-যে হাসিতেছিল তাহার ভিতরে কি
অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের
ভিতর হইতে একবার দেখিল-- তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী।

ধীবরের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল, ‘বুঢ়া তবে চলিলাম। তিন্দি গেলে তোর ঘরকন্না কে দেখিবো’

বুঢ়া একেবারে বালকের মতো কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল, ‘বুঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে তাহাকে এই আঙটি দিয়ো। বলিয়ো, তিন্দি যাইবার সময় দিয়া গেছে’ এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটির, নদীতীর,

কৈলুতরতল অন্ধকার, নিস্তন্ধ, জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জুলিখার মুখ বিবর্ণ। কর্তব্য যখন দূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল-- এখন সে কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। মনে মনে কহিল, ‘নব প্রেমের বৃত্ত হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফুটন্ত ফুলটিকে কোন্ রক্তস্রোতে ভাসাইতে যাইতেছি’

কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের দ্বারা নীত হইয়া শত সহস্র প্রদীপের অনিমেঘ তীব্র দৃষ্টির মধ্য দিয়া দুই ভগিনী স্বপ্নাহতের মতো চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের দ্বারের কাছে মুহূর্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল, ‘দিদি’

জুলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুষন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ-শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছে। আমিনা সসংকোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জুলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্তী হইয়া দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

জুলিখা বলিয়া উঠিল ‘দালিয়া!’-- আমিনা মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল-- ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া বিক্মিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাঘ, ১২৯৮